প্রসবজনিত ফিস্টুলা
এক করুণ অভিজ্ঞতা

OBSTETRIC FISTULA : A TRAGIC EXPERIENCE

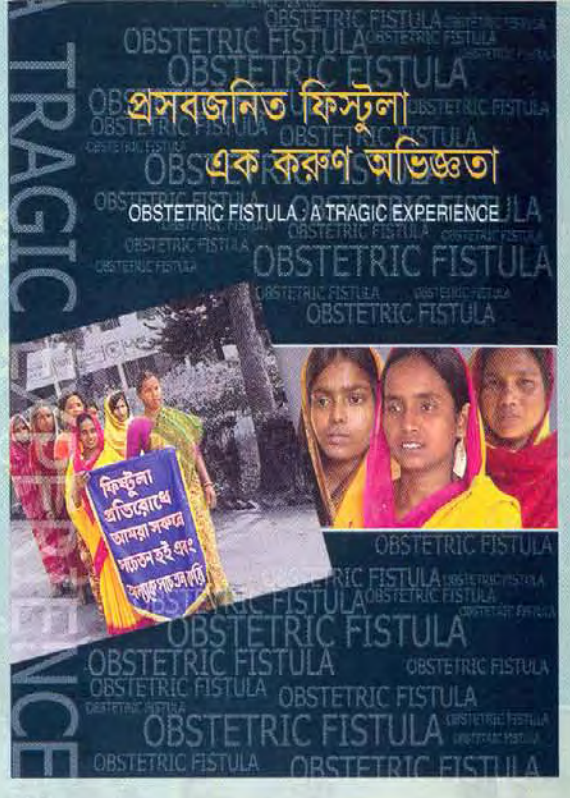

প্রসবজনিত ফিস্টুলা

এক করুণ অভিজ্ঞতা

OBSTETRIC FISTULA : A TRAGIC EXPERIENCE

প্রকাশক **Published by**
এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ EngenderHealth Bangladesh
কনকর্ড রয়্যাল কোর্ট Concord Royal Court
বাড়ী নং ৪০, রোড নং ১৬/এ (নতুন), House # 40, Road # 16/A (New)
২৭ (পুরাতন) ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯ 27 (Old) Dhanmondi R/A, Dhaka-1209
ফোন :(৮৮ ০২)৮১১৯২৩৪, ৮১১৯২৩৬ Phone : (88-02) 8119234, 8119236
৮১১৫০৭৭, ৯১১৭৫১৮ 8115077, 9117518
ফ্যাক্স :(৮৮ ০২)৮১১৯২৩৫ Fax : (88-02) 8119235
email:afaisel@engenderhealth.org email:afaisel@engenderhealth.org

প্রকাশকাল **Date of Publication**
সেপ্টেম্বর ২০০৮ September 2008

কাহিনী, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা **Story Collection, Cover Planning**
রুহিনা তাসমিন অনু Ruhina Tasmin Anu
ডাঃ এস এম শহীদুল্লাহ Dr. S.M. Shahidullah
রুনিয়া মাওলা Runia Mowla
মোঃ লিয়াকত আলী Md. Liaquat Ali
ডাঃ অপূর্ব চক্রবর্ত্তী Dr. Apurba Chakraborty

কাহিনী সংগ্রহকাল **Period of Story Collection**
জুন ২০০৭-আগস্ট ২০০৮ June 2007 - August 2008

আলোকচিত্র **Photography**
শঙ্খচিল শ্রুতিচিত্রন Shankhochil Srutichitron

গ্রাফিক ডিজাইন **Graphic Design**
টিমওয়ার্ক Teamwork

মুদ্রণ **Printed by**
পনির প্রিন্টার্স Panir Printers

আইএসবিএন ISBN
৯৮৪ ৭১৫ ০৪৪-৩ 984 715 044-3

ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রকাশিত মতামত প্রকাশকের নিজস্ব। এখানে প্রকাশিত মতামতের সাথে ইউএসএআইডি'র মতের মিল নাও থাকতে পারে।

Published with the financial assistance by the USAID. The opinions and views expressed here are those of the authors,' and do not necessarily reflect the views of the USAID.

সম্পাদনা পরিষদ EDITORS

ডাঃ আবু জামিল ফয়সাল **Dr. Abu Jamil Faisel**
কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ Country Representative
এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ EngenderHealth Bangladesh

মোসলেহ্‌ উদ্দিন আহ্‌মেদ **Moslehuddin Ahmed**
ডিরেক্টর প্রোগ্রাম্‌স Director Programs
এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ EngenderHealth Bangladesh

ডাঃ মিজানুর রহমান **Dr. Mizanur Rahman**
প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট (টেকনিক্যাল) Program Specialist (Technical)
এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ EngenderHealth Bangladesh

তওফিক জাহান **Tawfique Jahan**
প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট Program Specialist
এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ EngenderHealth Bangladesh

ডাঃ এস এম শহীদুল্লাহ **Dr. S.M. Shahidullah**
সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার Senior Program Officer
এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ EngenderHealth Bangladesh

রুনিয়া মাওলা **Runia Mowla**
কো-অর্ডিনেটর (জেন্ডার এন্ড ইনফরমড চয়েস) Coordinator (Gender & Informed Choice)
এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ EngenderHealth Bangladesh

ডাঃ অপূর্ব চক্রবর্ত্তী **Dr. Apurba Chakraborty**
প্রোগ্রাম অফিসার Program Officer
এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ EngenderHealth Bangladesh

ভূমিকা

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এখনো অনেক মহিলা প্রসবজনিত ফিস্টুলায় ভোগেন। বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত প্রসবের কারণে সৃষ্ট ক্ষতের মধ্য দিয়ে প্রসবপথে অনবরত প্রস্রাব বা পায়খানা বা উভয়ই ঝরাকে প্রসবজনিত ফিস্টুলা বলা হয়। এই সমস্যার পাশাপাশি ফিস্টুলা রোগীরা আরো অনেক শারীরিক সমস্যায় ভুগতে পারেন, তবে তারা সামাজিকভাবে যে অবহেলা এবং অবমাননার শিকার হন তা তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। এনজেন্ডারহেল্‌থ বাংলাদেশ বিগত ২০০৩ সালে ইউএনএফপিএ'র অর্থায়নে বাংলাদেশে প্রসবজনিত ফিস্টুলা পরিস্থিতির উপর একটি জরিপ পরিচালনা করে, যাতে দেখা যায় যে বাংলাদেশে প্রতি তিন হাজার বিবাহিত মহিলার মধ্যে পাঁচ জন প্রসবজনিত ফিস্টুলায় ভুগছেন। ২০০৫ সাল থেকে এনজেন্ডারহেল্‌থ ইউএসএআইডির আর্থিক সহায়তায় প্রসবজনিত ফিস্টুলা প্রতিরোধ, ফিস্টুলা রোগীদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তিনটি বেসরকারী হাসপাতালে কার্যক্রম শুরু করে। কার্যক্রমের আওতাধীন হাসপাতালগুলো হচ্ছে : মেমোরিয়াল খ্রিস্টান হাসপাতাল, কক্সবাজার, ল্যাম্ব হাসপাতাল, দিনাজপুর এবং কুমুদিনী হাসপাতাল, টাঙ্গাইল।

বিগত বছরগুলোতে প্রসবজনিত ফিস্টুলা রোগীদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা ফিস্টুলা রোগীদের ফিস্টুলা হওয়ার কারণ এবং ফিস্টুলাজনিত পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন মর্মস্পর্শী ঘটনার বিষয়ে জানতে পারি। আমরা দেখি যে প্রসবজনিত ফিস্টুলায় ভুগছেন এমন প্রায় সকল মহিলাই তাদের জীবনে অনেক করুণ ঘটনার শিকার হন; কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমাজে ফিস্টুলা রোগীদের এই সব দুঃখ যন্ত্রনার বিষয়ে তেমন কোন সচেতনতা এবং সাড়া নেই। ফিস্টুলা রোগীদের সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের দুর্দশা লাঘবের সচেতনতা জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহন বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে এনজেন্ডারহেল্‌থ ফিস্টুলা রোগীদের জীবনকাহিনী সংগ্রহ করে তা সংকলনের সিদ্ধান্ত নেয়।

এই সংকলনে ফিস্টুলা রোগীদের জীবনের যেসব ঘটনা বা দিক উঠে এসেছে তা শুধু এই ক'জন ফিস্টুলা রোগীর জীবনের ঘটনা বা সমস্যা নয়, দেশের অন্যান্য অনেক ফিস্টুলা রোগীর জীবন কাহিনীও এতে প্রতিফলিত হয়েছে। চারুবালা, সেবিকা বা মালেকার মতো আরো অনেক মহিলা ফিস্টুলার কারণে স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছেন, হয়েছেন রমিছা বা পার্বতীর মত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই বইয়ে চিত্রিত ফিস্টুলা রোগীদের মত আরো হাজার হাজার মহিলা এখনো দীর্ঘকাল ধরে ফিস্টুলায় ভুগছেন; কিন্তু ফিস্টুলার চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত আছেন। ফিস্টুলা রোগীদের চিকিৎসার সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত নিবেদিত প্রাণ এমন কয়েকজন সেবাদানকারীর সাক্ষাৎকারও এই সংকলনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ফিস্টুলা সেবাদানে তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং সেবাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার কথা এইসব সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে।

এই বইয়ে যাদের জীবন আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে তারা সবাই ফিস্টুলার চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু আমাদের সমাজের আরো অসংখ্য রমিছা, পার্বতী, সেবিকা, আনোয়ারারা ফিস্টুলায় ভুগছেন অথচ জানেন না এর চিকিৎসা আছে কিনা বা কোথায় এই চিকিৎসা হয়। শুধুমাত্র ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা এবং উদ্যোগই পারে ফিস্টুলা প্রতিরোধ করতে ও ফিস্টুলা রোগীদের চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে। এই পুস্তিকাটি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে উদ্যোগী হতে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ফলে নাম না জানা অসংখ্য ফিস্টুলা রোগীকে খুঁজে পেতে এবং তাদের করুণ জীবনের অবসান ঘটিয়ে নতুন জীবনদানে এই প্রকাশনাটি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করছি।

Preface

In many of the developing countries of Africa & South Asia including Bangladesh, a good number of women suffer from the obstetric fistula resulting from complicated and delayed home deliveries. Such a health condition is the state when a woman suffers from continuous dribbling of either urine or stool or both through the vagina due to obstructed or delayed labor. In fact, these complaints are associated with many other physical problems, but above all, the negligence and nonchalance by the society make their lives unbearable.

EngenderHealth Bangladesh, in co-operation with UNFPA conducted a survey in Bangladesh in 2003 which showed that 5 women among every 3000 ever married women of Bangladesh suffer from obstetric fistula. With the financial support from USAID, EngenderHealth began awareness raising for prevention of obstetric fistula and treatment and rehabilitation of the fistula patients in July 2005 at three private hospitals namely Memorial Christian Hospital, Chokoria, Cox's Bazar; Kumudini Hospital, Mirzapur, Tangail; and LAMB Hospital, Parbatipur, Dinajpur.

During the past few years, while working on fistula treatment and rehabilitation program we came to know the causes of the disease and depressing conditions in the lives of the victims of fistula.

These are really touchy and shocking. We find that almost all the female members of the society who suffer from fistula are to face various painful ordeals in their lives-but there is no conscious or positive response within the family or the society to address these pain and distress. To raise awareness and increase community participation in order to eliminate the miseries, EngenderHealth decided to collect and publish the real life stories of the fistula patients.

The different aspects of the stories of the victims mentioned in this booklet are not merely the expressions of the selected few, they are the reflections of numorous untold tragedies of unidentified fistula patients scattered throughout the country. There are many other women like Charubala, Sebika or Maleka who have been rejected by their husbands for having fistula; have been isolated from the family and society like Ramisa and Parboti and so on. Innumberable women are bearing this curse for long period of time and they have been deprived from treatment option as well.

This booklet has included the interviews of some whole-hearted, devoted service-providers who are closely connected with fistula service delivery. Their experiences in supporting fistula sufferers along with the inevitable constraints faced during the treatment and thereafter are presented in this booklet.

The patients whose stories are narrated in this book have been blessed with treatment services in the facilities. But there are many Ramisa, Parboti, Sebika and Anowara who are suffering from the curse of fistula not knowing whether any opportunity for treatment or even if a facility is available somewhere. The only way to help this large number of women is to expand social consciousness and awareness about the concept of identification and cure of the condition of obstetric fistula.

We believe that, this booklet will encourage people to build-up and enhance social-awareness about fistula and thus, will remain a milestone for the innumerable and unidentified victims of fistula of the country.

স্বামী কেন আমাকে ফেলে পালিয়ে গেলো? –মালেকা

Why did my husband leave me? - Maleka

Maleka was only 14 years old when she got married. She got pregnant twice 3 years apart. During the second pregnancy with a lot of complications she gave birth to a dead child at Memorial Christian Hospital. This delivery resulted in her developing obstetric fistula and consequently she was rejected by her husband. Maleka was operated for three times in, 2001, 2006 and 2007 respectively at Malumghat MC hospital free of cost. She became fully cured after the third operation. Now she lives a hard working and painful life with the only child in absence of her husband. She feels deeply sorrowed when she thinks that her husband has left her alone for having fistula, but she is grateful to Memorial Christian Hospital for giving her a new lease of life.

৯ বছরের ছেলেকে নিয়ে মালেকা বেগম (২৬) থাকেন তার মায়ের বাড়ি চাকমার কুল নয়াপাড়াতে। মালেকা বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে নিজের ও ছেলের খাবার জোগাড় করে। ১৪ বৎসর বয়সে মালেকার বিয়ে হয় কক্সবাজার এর ফতেহার কুল গ্রামের দিনমজুর মোহাম্মদ আলম এর সাথে।

মালেকা বলেন– "বিয়ের ৩ বৎসর পর পেটে বাচ্চা আসে। কোন চেক-আপ হয় নাই তবে স্বাস্থ্যকর্মী এসে দুটো টিকা দিয়ে গিয়েছিল। নয় মাসে আমার ব্যথা উঠে। ধাত্রীর হাতে পুত্র সন্তান জন্মায়। প্রথম বাচ্চা জন্মের তিন বছর পর আবার গর্ভবতী হই। এবারও নয় মাসে ব্যথা শুরু হয় এবং পানি ভাঙ্গতে থাকে। ডাক্তার ডাকা হয় নাই। ব্যথাও এক সময় থেমে যায়। এর প্রায় ২-৩ দিন পর আবার ব্যথা শুরু হয়। দাই এসে চেষ্টা করে পারেনা। তখন রামু হাসপাতাল থেকে নার্স এনে চেষ্টা করা হয় একদিন একরাত। সে ও কিছু করতে পারে না। তারপর আমাকে কক্সবাজার আল-ফুয়াদ হাসপাতাল এ নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার উপস্থিত না থাকায় নার্স ইঞ্জেকশন দিয়ে বাচ্চা বের করার চেষ্টা করে। তখন প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। ওখান থেকে আমাকে রাতে বাড়িতে নিয়ে আসে। পরের দিন সকালে আমাকে মালুমঘাট এমসিএইচ হাসপাতালে নিয়ে যায় সেখানে অপারেশন করে একটি মরা বাচ্চা বের করে।

এই মরা বাচ্চা হওয়ার পর থেকেই আমার সব সময় প্রস্রাব ঝরে। আমার স্বামী আমাকে হাসপাতালে ফেলে পালিয়ে যায়। আজ ও তার সন্ধান আমি পাইনি।"

গত ২০০১ সালে প্রথমবার, ২০০৬ সালে দ্বিতীয়বার এবং ২০০৭ সালে তৃতীয়বার মালেকার ফিস্টুলা অপারেশন হয় মালুমঘাট এমসিএইচ হাসপাতালে। তৃতীয় অপারেশনের পর মালেকা সুস্থ হয়ে যান। মালেকা বলেন– "আমি বর্তমানে সুস্থ আছি। মালুমঘাট এমসিএইচ হাসপাতালে বিনা টাকায় আমার অপারেশন হয়েছে। টাকা দিয়ে চিকিৎসা করাতে হলে সারাজীবনে ও করানো হতো না। স্বামীর অবর্তমানে ছেলেকে নিয়ে বড় কষ্ট করে দিন কাটাচ্ছি। ছেলেকে ঠিকমত খেতে দিতে পারি না। আমার স্বামী কেন এভাবে পালিয়ে গেলো? আমার কি অপরাধ? আমি তো তার সন্তানকেই জন্ম দিয়েছি। আমি মানুষের বাড়িতে কাজ করে, পাটি বুনে ছেলের ও আমার খাওয়া জোগাড় করি। সংসারে এমন কেউ নেই যে আমাদের একবেলা ডেকে খাওয়ায়। কিভাবে ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখবো তাই ভেবে পাই না। আমি খুব অসহায় অবস্থায় আছি। আল্লাহ যদি আমাকে এমন রোগ না দিতো তাহলে আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে যেত না।"

প্রত্যেক সফল ফিস্টুলা অপারেশন আমাকে গভীর আনন্দে উদ্বেলিত করে

– অধ্যাপক ডাঃ সায়েবা আকতার

"Every successful fistula surgery moves me deeply and renders a lot of joy and pleasure"

- Prof. Dr. Sayeba Akhter

Fistula is not merely a disease, it is something more than that. When I started my career as a Physician, I did not have any special training on fistula operation. So, I tried to enhance my skill by reading books related to gynecological operations which offered me a better result after some time. In 1998 I got a chance for one month training in England on fistula repair. This opportunity helped me very much and from then on I began to think over the establishment of a fistula center in our country. To operate on a fistula patient is the most important and a great job in my eyes. None will be able to estimate or measure the burden of their grief and isolated life other than those who observe them very closely.

It is a signal of hope; the fistula is fully curable by operation. So, the pleasure of carrying a woman from a dark life to light is really a thing that cannot be compared to any other performance.

ফিস্টুলা আসলে কেবলমাত্র একটি রোগ নয়। এটা তার চাইতে আরও বেশী কিছু বলে আমার মনে হয়। আমি আমার ডাক্তারী জীবনের শুরুতে ১৯৭৮ সালে ফিস্টুলা রোগীদের পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ছিলাম। তখন থেকেই ফিস্টুলা অপারেশন করার জন্য মনের ভেতরে ভীষণ একটা তাগিদ অনুভব করতাম। কিন্তু তখন আমার সাধ্য ছিল না। আমার দক্ষতাও কম ছিলো। তবে এই বিষয়টিকে তখন থেকেই মনের ভেতরে লালন করেছি– ওদের সমস্যা, ওদের কষ্ট, ওদের না পাওয়ার ব্যথা। তারপর সুযোগ এলো ১৯৮৮ সালে। আমি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে বরিশাল মেডিকেল কলেজে যোগ দিলাম এবং স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ পেলাম। আমি গাইনী বিভাগের ৮টি বিছানা ফিস্টুলা রোগীদের জন্য বরাদ্দ করে দিলাম।

প্রথমদিকে বেশি রোগী না আসলেও পরে এত রোগী আসতে শুরু করলো যে আমি আর সামাল দিতে পারছিলাম না। তখন ফিস্টুলা অপারেশনের জন্য আলাদা করে আমার কোন ট্রেনিংও নেয়া ছিলো না। আমি গাইনী অপারেশনের যে বইগুলো আছে সেগুলো পড়ে পড়ে দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। ১৯৯৫ সালে আমি ইংল্যান্ড যাই রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ কোর্স করবার জন্য। সেখানে ফিস্টুলা নিয়ে নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখে আমি ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হই। ফিরে এসে আমি ওদের কাছে চিঠি লিখি যে ফিস্টুলা অপারেশনে আমি কিভাবে নিজেকে দক্ষ করে তুলতে পারি। ইতোমধ্যে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেই এবং নিয়মিত ফিস্টুলা অপারেশন করতে থাকি। তখন কিন্তু আমার সফলতার হার ৯০% এ চলে এসেছে। ১৯৯৫ সালে লেখা চিঠির জবাব আসে ১৯৯৮ সালে; তখন আমি একমাসের ফিস্টুলা রিপেয়ার ট্রেনিং করতে ইংল্যান্ডে যাই। তখনই আমি ভাবতে শুরু করলাম যে, দেশে এসে একটা ফিস্টুলা সেন্টার করা যায় কিনা। দেশে ফিরে ফিস্টুলা সেন্টার দাঁড় করাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। একটা বিষয় তখন গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম যে, ফিস্টুলা অপারেশনের চাইতেও বেশী জরুরী ডাক্তারদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া। কারণ, আমি যদি অনেক ভাল অপারেশনও করি আমার একার পক্ষে খুব বেশী রোগীর অপারেশন করা সম্ভব নয়। তখন আমি আমার কনসেপ্ট পেপারে ট্রেনিং এর উপর বেশি জোর দিলাম। তারপর মাথায় এলো ফিস্টুলা রোগীদের পুনর্বাসনের কথা। একের পর এক বিভিন্ন বিষয় একত্রিত করে কনসেপ্ট পেপার জমা দেবার পর একপর্যায়ে সরকার তা গ্রহণ করে। ইউএনএফপিএ ও অনুদান দেয়। বর্তমানে ফিস্টুলা সেন্টারটি এখনও সঠিক অবস্থায় পৌছাতে পারেনি তবে অচিরেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৩ তলায় ৬৯ বেডের ফিস্টুলা সেন্টার হবে যার প্রধান লক্ষ্য থাকবে ট্রেনিং ও রোগীদের পুনর্বাসন। আনন্দের বিষয় যে সরকার যখন এই ধরনের উদ্যোগ নিলো তখন কিন্তু এনজিওরাও বসে থাকলো না। সবার আগে এগিয়ে এলো এনজেন্ডারহেল্‌থ।

তারা তিনটি সেন্টারে ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ, রোগীদের হাসপাতালে আনা, বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা প্রদান প্রভৃতির ব্যবস্থা করলো। আমার মনে হয় ফিস্টুলা রোগীদের ৩ টা জীবন– ওদের পিছনে ফেলে আসা সুখের জীবন যখন তাদের ফিস্টুলা হয়নি, তারপর ফিস্টুলা আক্রান্ত জীবন– যখন ওরা সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা নিগৃহীত জীবন কাটায়, তারপর আবার যখন ভাল হয়ে যায়– তখন তারা যেন আবার নতুন জীবন ফিরে পায়– এটা যে কি পরম পাওয়া সেটা, কোনো ফিস্টুলা রোগীকে যে অপারেশন করেছে সে ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারবে না। আশার কথা যে, এটা এমন একটা রোগ যা অপারেশন করলে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায়। একটা অন্ধকার জীবন থেকে একজন নারীকে আলোর জীবনে এনে দিতে পারার এই যে আনন্দ তার সাথে পৃথিবীর আর কোনো আনন্দের তুলনা হয় না।

দীর্ঘ ১৭ বছর আনোয়ারার কোন চিকিৎসা হয়নি, এখন কুমুদিনীতে

For long 17 years Anowara did not get any treatment now she is at Kumudini Hospital

Lying on the bed of the hospital, the helpless eyes of Anowara always search someone beside her. Carrying the painful obstetric fistula for 17 years, Anowara did not get any treatment facility. She developed the trouble at the time of her first delivery of a dead child by caesarean section at Mymensingh Medical College Hospital. But none of her family members was eager or able to offer any minimum treatment option. A male village health worker advised Anowara to go to Kumudini Hospital for free medical treatment and she got the chance to be operated for the first time in 2008. But the case turned to a complex one. Prof. Dr. Anwarul Azim's thinks that "it may take time and more than one operation for full recovery and if I can show a success, this will be one of my greatest achievements in fistula surgeries."

আনোয়ারা (৩৩) থাকেন ময়মনসিংহের ভালুকায়। বিয়ের সময় তার বয়স ছিলো মাত্র ১৬ বছর। বিয়ের ৩ মাস পরেই গর্ভধারণ করেন।

আনোয়ারা বলেন– "আমার প্রথম ডেলিভারীর পর থেকেই সবসময় প্রস্রাব ঝরে। প্রসব ব্যথা উঠবার পর প্রথম দিন সারাদিন সারারাত বাড়িতে রাখা হয় আমাকে। তারপর দ্বিতীয় দিন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে আনা হয়। এই সময় আমার টাইফয়েড হয়েছিলো। তৃতীয় দিন সিজার করে মৃত বাচ্চা বের করা হয়। সিজারের পর আমার দুই পা অবশ হয়ে গিয়েছিলো। পিজি হাসপাতালে দুইবার এসে চিকিৎসা করাবার পর পা ভাল হয়, তখন প্রস্রাব ঝরার অপারেশনের জন্য ডাক্তার আমাকে তিন মাস পরে যেতে বললেও আমার আর যাওয়া হয়নি। কারণ, যে মামা আমার চিকিৎসা করাচ্ছিলেন তিনি মারা গিয়েছিলেন।"

আনোয়ারার গরীব বাবা মা জমিজমা বেঁচে যতটা সম্ভব চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু আনোয়ারা ভাল হননি। দীর্ঘ ১৭ বছর যাবত তিনি বহন করে চলছেন এই নিদারুণ যন্ত্রণা।

আনোয়ারা বলেন– 'মামা মারা যাবার পর স্বামী অথবা অন্য কেউ আমাকে ডাক্তার দেখানো বা হাসপাতালে নেয়ার কথা আর কোনদিন বলে নাই। আর আমার নিজের কাছে টাকা না থাকায় দিনের পর দিন প্রস্রাব ঝরার অসুখ নিয়াই দিন কাটাইছি। তাছাড়া কাছাকাছি কুমুদিনী হাসপাতালে যে অপারেশন হয় তা জানতাম না আর ঢাকায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। ঢাকায় যাবার মত টাকা এবং নিয়ে যাওয়ার লোক ছিল না।'

> *আনোয়ারা তার স্বামীকে কোন সন্তান উপহার দিতে পারেনি। তাই ৪ বছর আগে সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বামীকে আবার বিয়ে করিয়েছে। সতীন সারাক্ষণ তাকে তাড়িয়ে দিতে চায়। তারপরও সে কোন রকমে মাথা গুঁজে পরে আছে। আনোয়ারার স্বামী বোঝে যে, তার সন্তান জন্ম দিতে গিয়েই আনোয়ারার এই অবস্থা*

আনোয়ারা জানতেন যে অপারেশন করলে এই রোগ ভাল হয়। তারপরেও দীর্ঘ ১৭ বছরে সেই চিকিৎসাটুকু পাবার সুযোগ হয়নি তার। গ্রামের এক পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে আনোয়ারা একদিন জানতে পারেন কুমুদিনী হাসপাতালে বিনা পয়সায় ফিস্টুলা রোগের অপারেশন হয়। তথ্য নিয়ে সে নিজেই এখানে এসে ভর্তি হয়। পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তার প্রথম অপারেশন হয়। এখন আনোয়ারা পোস্ট অপারেটিভ কক্ষে।

ডাঃ অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম বলেন, "আনোয়ারার কেসটা অত্যন্ত জটিল। দীর্ঘদিন বিনা চিকিৎসার কারণে এরকম জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। হয়তো একাধিক অপারেশন প্রয়োজন হতে পারে। তবে সফল হতে পারলে এটি হবে আমার জীবনে যতগুলো ফিস্টুলা অপারেশন করেছি তার মধ্যে অন্যতম।" আনোয়ারা তার স্বামীকে কোন সন্তান উপহার দিতে পারেনি। তাই ৪ বছর আগে সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বামীকে আবার বিয়ে করিয়েছে। সতীন সারাক্ষণ তাকে তাড়িয়ে দিতে চায়। তারপরও সে কোন রকমে মাথা গুঁজে পরে আছে। আনোয়ারার স্বামী বোঝে যে, তার সন্তান জন্ম দিতে গিয়েই আনোয়ারার এই অবস্থা। তাই সে আনোয়ারার নামে দু'কাঠা জমি লিখে দিয়েছে। কিন্তু এর বাইরে সে আনোয়ারার চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে নারাজ। হাসপাতালের বেডে অসহায় আনোয়ারার শূন্য দৃষ্টি সারাক্ষণ কি যেন খুঁজে ফেরে।

আমি আমার হারানো স্বামীকে ফিরে পেয়েছি– সেলিনা

I have found my lost husband -Selina Akter

This is the story of one Selina Akter, a village housewife from Cox's Bazar who found back her husband and family after overcoming the curse of fistula for which she suffered for long 13 Years. In her own version- "I was only 17 years old when I got married with Firoz Ahmed. I became pregnat within three months. After nine months, I delivered a dead child at Rabeta Hospital following two days of labour pain. I had to stay there for 22 days and returned home with urine coming out through my vagina without any control. As such I was rejected by my husband. I went to Chittagong Medical College Hospital, but I could not receive permanent cure. Rather, I had to carry the second child immediately and gave birth to a son at seven months at home. Still my husband left me for seven years keeping behind a lot of distress for me. When he returned, I had to carry for the 3rd time again and delivered a daughter. This time my husband learned about the fistula operation provided at the Malumghat Hospital and took me there in 2006. The doctors did a successful operation and I got a new life free of the disease. Now my husband is happy and lives with me and our two children."

কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার চাকমার কুল সাহাম্মদের পাড়া গ্রামের গৃহবধু সেলিনা আক্তার তার স্বামীকে ফিরে পাবার কাহিনী বর্ণনা করেন এভাবে– "এখন আমার বয়স ৩২ বছর। আমি সতের বৎসর বয়সে বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে বউ হয়ে আসি ফিরোজ আহাম্মদের ঘরে। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক মজবুত হওয়ার আগেই তিন মাসের মধ্যে আমি গর্ভবতী হই। গর্ভাবস্থায় চেক-আপ হয়নি তবে ২টা টিকা দিয়েছি। নয় মাসে আমার প্রসব ব্যথা শুরু হয়। দুই দিন ব্যথা থাকার পর হাসপাতালে নিয়ে অপারেশন করে মরা বাচ্চা বের করে। বাইশ দিন হাসপাতালে ছিলাম। বাড়ি আসার পর থেকে প্রস্রাব ঝরার সমস্যা শুরু হয়।

শ্বাশুড়ী প্যারালাইসিস রোগী। তার সমস্ত সেবাযত্ন এবং সংসারের সব কাজ আমি একাই করতাম। এরপরও স্বামী আমাকে বাপের বাড়ি চলে যেতে বলতো এবং বিয়ে করতে চাইতো। চার মাস পরে স্বামী আমাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে আলট্রাসনোগ্রাম করানো হয় এবং কিছু ঔষধ পত্র দিয়ে দেয়। কিন্তু আমি সুস্থ হইনি। এর প্রায় দুই মাস পর আমার পেটে আবার বাচ্চা আসে। এবার আমাকে মালুমঘাট এমসিএইচ হাসপাতালে নিয়মিত চেক-আপ করানো হয়। সাত মাসে আমার ব্যথা উঠে এবং বাড়িতেই পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। সন্তান জন্ম নেয়ার কিছুদিন আগেই আমার স্বামী আমার সাথে রাগ করে সৌদিআরবে কাজ নিয়ে চলে যায়। আসলে সে আমার প্রস্রাব ঝরার রোগের কারণে আমাকে ঘৃণা করতো এবং আবার বিবাহ করতে চাইতো। কিন্তু আমার বাবার বাড়ির লোকদের ভয়ে তা করতে পারছিলো না। আমি তাকে অনেক বোঝাতাম, অনেক কান্নাকাটি করতাম কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতো না। সে বলতো আমি নাকি তার জীবনটা শেষ করে দিয়েছি। আমার উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত। আমার শ্বাশুড়িও বিয়ে করতে তাকে বাঁধা দিতো। ছোট বাচ্চা নিয়ে আমি এ সময় অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করি।

প্রস্রাব ঝরার সমস্যা আমাকে খুব যন্ত্রণা দিচ্ছিলো। দ্বিতীয় বাচ্চা জন্মের ৭ বছর পর স্বামী বিদেশ থেকে আসে এবং আমি আবার গর্ভবতী হই। এবার ও আমি মালুমঘাট এমসিএইচ হাসপাতালে নিয়মিত চেক-আপ করাই। নয় মাসে আমার একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। তৃতীয় বাচ্চা হবার দুই বছর পর গত ২০০৬ সালে আমার স্বামী লোকমুখে শুনে আমাকে মালুমঘাট এমসিএইচ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানকার ডাক্তাররা আমার অপারেশন করেন এবং একবারের অপারেশনে আমি সুস্থ হয়ে নতুন জীবন ফিরে পাই। আমি সুস্থ না হলে আমার স্বামী হয়তো এক সময় আবার বিয়ে করতো অথবা বিদেশে চলে যেত। তের বছর ধরে আমি এই রোগের অভিশাপ বহন করেছি। বর্তমানে আমার স্বামী খুব খুশী। সে আর বিয়ে করতে চায় না। আমার উপর অত্যাচারও করে না। আমরা বর্তমানে ভালভাবে সংসার করছি এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে সুখেই দিন কাটাচ্ছি।"

মেমোরিয়াল খ্রিস্টান হাসপাতাল

সফল ফিস্টুলা অপারেশন করা আমার জীবনের একটা মিশন

– অধ্যাপক ডাঃ আনোয়ারুল আজিম

Conducting a successful fistula operation is one of my missions

- Prof. Dr. Anwarul Azim

In our country delayed delivery results in obstetric fistula of the mothers. Such victims are generally rejected by the husband or family and no attempts are made for their recovery due to illiteracy and ignorance. Dr. Anwarul Azim, a renowned fistula surgeon cites the complex case of Anowara, who has been recently operated by him but cannot be assured of complete recovery. A successful fistula operation undoubtedly offers a new life to the patient and it is one of the missions in my life to perform the duty'- says Dr. Anwarul Azim.

অধ্যাপক ডাঃ আনোয়ারুল আজিম দীর্ঘদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্ত্রী-রোগ ও প্রসুতি বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহনের পর বর্তমানে তিনি মির্জাপুরে কুমুদিনী হাসপাতালে ফিস্টুলা সার্জন হিসেবে কর্মরত আছেন।

অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম বলেন– "গত ৮ মাসে আমি কুমুদিনী হাসপাতালে প্রায় ৩০টি ফিস্টুলা অপারেশন করেছি। তার মধ্যে ২৫/২৬টি কেস এ সফল হয়েছি। ফিস্টুলা রোগীদের সুস্থ করে তোলাকে আমি আমার জীবনের একটা মিশন হিসেবে নিয়েছি। যতদিন বেঁচে থাকবো আমি চেষ্টা করে যাবো যাতে এই ফিস্টুলা আক্রান্ত মহিলাদের আমি একটা নতুন জীবন দিতে পারি। ফিস্টুলা অপারেশন যদি সফল হয় তবে ঐ রোগীকে নতুন জীবন দান করা হয়। আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বেশীরভাগ ফিস্টুলা রোগীই স্বামী পরিত্যক্তা হয়। এরা পরিবার আত্মীয় স্বজন-পাড়া প্রতিবেশীদের ঘৃণা ও অবহেলা পায় এবং মানবেতর জীবনযাপন করে।"

অধ্যাপক ডাঃ আনোয়ারুল আজিম জানান, আমাদের দেশের মেয়েদের সাধারণত প্রসবজনিত ফিস্টুলা হয়। বিলম্বিত প্রসবের কারণে অর্থাৎ ১২ ঘণ্টার বেশি সময় পার হয়ে গেলে বাচ্চার মাথার চাপে মূত্রথলি অথবা মলাশয় ছিদ্র হয়ে যায়। ফলে মায়ের অনবরত পেশাব অথবা পায়খানা ঝরতে থাকে যার উপর তার নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

সদ্য অপারেশন করেছেন এমন একটি কেস এর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "জটিল কেস হলে অনেকবার অপারেশন করার প্রয়োজন হতে পারে, যেমন আনোয়ারা নামের একজন মহিলা যার কেসটি অত্যন্ত জটিল ছিলো। ১৭ বছর ফিস্টুলা রোগে ভোগার পর এই প্রথম তার অপারেশন হলো। এই মহিলাটির রিপেয়ার কতটা ভালভাবে হয়েছে তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। তার আরও অপারেশন প্রয়োজন হতে পারে। বর্তমানে সে কুমুদিনী হাসপাতালের পোস্ট অপারেটিভ এ আছে। যদি আমি আনোয়ারার ফিস্টুলা অপারেশনে সফল হতে পারি তবে সেটা হবে আমার জীবনের একটি অন্যতম অপারেশন- Vesico Vaginal Fistula-র ক্ষেত্রে। বিলম্বিত প্রসব ছাড়াও কখনো কখনো হাসপাতালে সিজার করার সময়েও ব্লাডার কোনভাবে ফুটো হয়ে যেতে পারে। বেশির ভাগ ফিস্টুলা রোগীকেই দেখেছি পানি কম খেতে। তারা ভাবে পানি কম খেলে পেশাব কম হবে। ফলে রোগীর কিডনী সংক্রান্ত জটিলতার সৃষ্টি হয়। আমার অভিজ্ঞতায় আর একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, বেশির ভাগ মহিলারা প্রচন্ড রকমের গরীব হয়ে থাকে। এরা অশিক্ষিত ও পরনির্ভরশীল হয়ে থাকে। এমনকি যখন অপারেশনের জন্য আসতে বলা হয় তখন আসবে কি আসবে না, সেই সিদ্ধান্ত নেবার মতো অবস্থাও এদের থাকে না। অথচ এরা বছরের পর বছর ফিস্টুলায় ভুগতে থাকে। একটি সফল ফিস্টুলা অপারেশন মানে একজন নারীর সম্পূর্ণ নতুনভাবে জীবন ফিরে পাওয়া।"

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফিস্টুলা ওয়ার্ড

ফিস্টুলার কারণে রমিছা বেগম দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে স্বামী পরিত্যক্তা

Ramisa Begum abandoned by her husband for long 30 years due to fistula.

Ramisa, 42 years old, is an unfortunate, depressed lady from Rangpur, bearing the curse of fistula for long 30 years. She was married and prematurely became pregnant. Following prolonged labour she gave birth to a dead child at the Dinajpur Haldibari Hospital and developed obstetric fistula and she was rejected by the husband then & there. Ramisa again got married but because of bad odour she was again thrown out of home after two days. In LAMB Hospital stones were removed from her kidneys by consecutive operations. But fistula was not fully repaired after two operations. So, Ramisa was taken in for third operation and the doctors would need to observe her after 3 months. Ramisa always lives with a bad smell so that her husband, family or society have left her alone. Yet she hopes to have a free, cured and better living for her own.

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার বামনা বাজার শেখ পাড়া গ্রামের মেয়ে রমিছা বেগম। বর্তমান বয়স ৪২ বছর। দীর্ঘ ৩০ বছর রমিছা স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে বাবার বাড়িতে এক কোণে আশ্রয় নিয়েছেন।

রমিছা বলেন– "১২ বছর বয়সে বিয়ে হয় আমার একই গ্রামের জাফর আলীর সাথে। বিয়ের ঠিক ৩ মাসের মাথায় পেটে বাচ্চা আসে। বাচ্চা হওয়ার সময় একদিন একরাত আমি বাড়িতেই থাকি। তারপর আমাকে দিনাজপুরের হলদিবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মরা বাচ্চা খালাস করে। ঐ ডেলিভারীর সময় থেকেই আমার ফিস্টুলা অসুখ শুরু হয়। আমার স্বামী আমাকে তখনই ত্যাগ করে।"

৩ মাস এর মাথায় রমিছার স্বামী আবার বিয়ে করে। বাবা তাকে নিয়ে আসে। তারপর থেকে সে বাপের বাড়িতেই আছে। এখন বাবা মা কেউ বেঁচে নেই। এক ভাই আছে সে দিনমজুর। আলাদা থাকে। রমিছা নিজে কাজ করে নিজের খাবারের ব্যবস্থা করে।

দুঃখিনি রমিছা বলেন "বছর খানেক পরে সরদার পাড়া গ্রামের দিনমজুর মোজার সাথে আমার আবার বিয়ে হয় কিন্তু আমার শরীর থেকে দূর্গন্ধ আসে, সবসময় প্রশ্রাব ঝরে বলে বিয়ের ২ দিন পরে আমাকে ঐ স্বামীও বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তারপর থেকে এভাবেই আছি। শরীর থেকে দূর্গন্ধ আসে বলে কেউ কোন কাজ দিতে চায় না। যতটুকু কাজ করতে পারি তাই দিয়ে বেশীর ভাগ সময়ই না খেয়ে দিন কাটাই।"

রমিছার পরপর দুইবার ফিস্টুলা অপারেশন হয় ল্যাম্ব হাসপাতালে। কিন্তু অপারেশন সফল হয়নি। ল্যাম্ব হাসপাতালে তার তৃতীয় অপারেশন হয় মাত্র ২ মাস আগে। এবারও রমিছা সুস্থ হননি। ৩ মাস পরে ডাক্তার তাকে আবার হাসপাতালে যেতে বলেছেন।

"সামনের মাসে আবার ল্যাম্ব হাসপাতালে যাবো। আমি এখনো সুস্থ হই নাই। আমি ভাল হতে চাই। তাতে যতবার লাগে অপারেশন করাবো। চিকিৎসা করানোর টাকা নাই বিধায় আমাকে আবার ল্যাম্ব হাসপাতালেই যেতে হবে। সুস্থ হলে অন্তত কর্ম করে খেতে পারবো।"–রমিছা বলেন।

রমিছার বাড়িতে ভাঙ্গাচোরা জীর্ণ একটি ছনের কুটির। তারই বারান্দার এককোণে পড়ে থাকে সে। কোনদিন খেয়ে কোনদিন না খেয়ে তার দিন যায়। গায়ে প্রচন্ড দুর্গন্ধ। স্বামী, পরিবার, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন সে। মানুষ তাকে কাজে নেয় না। যেদিন কপাল ভালো থাকে সেদিন জোগালির কাজ করে কিছু পয়সা পায়।

কথা বলার সময় তার চোখের কোল থেকে পানি পড়ছিল বারবার। হাসপাতাল থেকে তাকে বলেছে আবার অপারেশন করা হবে এবং সে সুস্থ হবে। তাই সে স্বপ্ন দেখছে ভালো হবার, স্বপ্ন দেখছে ভালোভাবে বেঁচে থাকার। তিরিশ বছর যাবত ফিস্টুলার অভিশাপ বহন করতে করতে রমিছা ভীষণ ক্লান্ত।

গ্রামের ডাক্তার ছুরি দিয়ে পার্বতীর পেটের বাচ্চার মাথার চাঁদি কেটে ফেলে

The quacks severed the vault of scalp of Parbati's baby by a sharp knife

Parboti, quite alone a lady in her own world, is suffering from the curse of obstetric fistula for long 15 years. Everyone avoids her for the bad smell of urine around her that resulted from the unscientific method of delivery of a dead child by the illiterate, ignorant midwives and quacks. Her family did not know about the availability of any facilities and also could not afford the cost of her proper treatment. A family planning worker conveyed Parboti the information about the free operation service offered by the Mirzapur Kumudini Hospital. Parboti wants to have the opportunity-so she is now waiting there for a chance in her life. She says- 'I like to live with a raised head I seek the blessings of all.'

"আমার নিজের প্রতি ঘেন্না হয়। গত ১৫ বছর দুর্গন্ধে মানুষ আমার কাছে আসতে পারে না। শীতের রাতে বারবার উঠে কাপড় বদলাতে হয়। রাতে বিছানা ভিজিয়ে ফেললে স্বামী আমাকে লাথি মেরে বিছানা থেকে ফেলে দেয়।" –গোপালপুর, টাঙ্গাইল এর বাসিন্দা পার্বতী বালা দাস (৩০) মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতালের প্রি-অপারেটিভ রুমে বসে অশ্রুসিক্ত হয়ে কথাগুলো বলছিলেন।

নিজের জীবনের প্রতি ভীষণ বীতশ্রদ্ধ পার্বতী। গত ১৫ বছর ধরে তিনি ফিস্টুলার অভিশাপ বহন করে আসছেন। তার বিয়ে হয় ১৪ বছর বয়সে। বিয়ের এক বছর পরে তার গর্ভে সন্তান আসে। প্রথম সন্তানের মুখ দেখার স্বপ্নে বিভোর ছিল পার্বতী। কিশোরী পার্বতী তখন জানত না গর্ভকালীন সময়ে মায়ের যত্নের কথা।

জানেন না ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করাবার কথা। সংসারের মুরুব্বী যারা আছেন তাদের অবস্থাও তথৈবচ। অজ্ঞতা, অশিক্ষা এবং দারিদ্র তাদের জড়িয়ে রেখেছে আষ্টেপৃষ্ঠে।

পার্বতী বলেন– "ব্যথা উঠবার পর পুরো ৩ দিন গ্রাম্য দাই বাচ্চা বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় একজন গ্রাম্য ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়। সেই ডাক্তার এসে ছুরি দিয়ে বাচ্চার মাথার চাঁদি কেটে মরা বাচ্চা বের করে। আমার স্বামী অথবা অন্য কেউ তখন হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেয়নি। আর আমার অবস্থা এতো খারাপ ছিলো যে কথা বলার মত কোন অবস্থা ছিলো না। মরা বাচ্চা হওয়ার কয়েকদিন পর থেকেই প্রস্রাব ঝরার এই অসুখ শুরু হয়ে যায়। স্বামীকে চিকিৎসার কথা বলার পরেও স্বামী কিছুই করতে পারে নাই। কারণ, চিকিৎসা করানোর মত আর্থিক অবস্থা তার ছিলো না।" দীর্ঘ পনের বছর এই অসহায় বেদনার্ত নারী ভূগছেন ফিস্টুলার যন্ত্রনায়। পার্বতীর আর মা ডাক শোনা হলো না। তার স্বামী তার সঙ্গে কদাচিৎ ভালো ব্যবহার করেন। তারা এক বিছানায় দুইজন দুই প্রান্তে শুয়ে থাকেন।

পার্বতী বলেন– "এই পৃথিবীতে আমার আপন বলতে কেউ নাই। আমার বাবা মা ভাই বোন নাই, শ্বশুড়বাড়িতেও কেউ নাই। সন্তানও নাই আমার। স্বামীর কি দোষ? তারে তো বারবার বলার পরেও সে আর একটা বিয়ে করতে রাজি হয় না। সে বলে-দুইজনারই খাওয়া জোটে না, আর একজন আসলে কি খাইবে?"

পার্বতী নিজের পৃথিবীতে ভীষণ একাকী একজন মানুষ। তার সমস্ত মুখ খানিতে বিষাদ মাখা। অপরাধীর মত সে মাথা নীচু করে রাখে। পৃথিবীতে কারোর প্রতি তার কোন অভিযোগ নেই। পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর মাধ্যমে পার্বতী জানতে পেরেছে মির্জাপুরে কুমুদিনী হাসপাতালে বিনা পয়সায় এই রোগের চিকিৎসা হয়, তাই সে কাউকে না জানিয়ে সেখানে গিয়েছে এবং এখন অপেক্ষা করছে অপারেশন এর জন্য। পার্বতী বলেন– "আমি মাথা উচু করে বাঁচতে চাই। আমি সবার আশির্বাদ চাই।"

> *"এই পৃথিবীতে আমার আপন বলতে কেউ নাই। আমার বাবা মা ভাই বোন নাই, শ্বশুড়বাড়িতেও কেউ নাই। সন্তানও নাই আমার। স্বামীর কি দোষ? তারে তো বারবার বলার পরেও সে আর একটা বিয়ে করতে রাজি হয় না"*

প্রসবজনিত ফিস্টুলা অপারেশন শতভাগ সফল হয় না বলেই প্রতিরোধটা অনেক বেশি জরুরি

– প্রফেসর ডাঃ কোহিনুর বেগম

As because fistula operation may not come out cent-percent successful prevention is much more essential

- Prof. Dr. Kohinoor Begum

During my service life as an Asstt. Professor, I began to operate on fistula patients caused by complex-delivery although I was not an expert at that time. The procedure was not as expensive then. Now, as the Head of the Department of Gynae/Obstetric at the National Fistula Center of Dhaka Medical College Hospital I have been performing innumerable operations. I have never counted the number of operations I have done so far; rather, I always try to apply an improved method with a successful completion. I could realize the pains of the fistula sufferers, I think that prevention of the condition rather than operation is more essential and that should be done on a large scale.

"১৯৮২ সালে আমি যখন এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হই তখন থেকেই প্রসবজনিত ফিস্টুলা অপারেশন করতাম। তবে তখন আমি ততটা দক্ষ ছিলাম না এই কাজে। আমি প্রফেসর সুরাইয়া জাবিন কে এই অপারেশনে এ্যাসিস্ট করতাম। সে সময়ে খুব কম ফিস্টুলা রোগী হাসপাতালে আসতো। দক্ষ সার্জনও খুব কম ছিলো। আর বেশিরভাগ রোগীই আসলে জানতো না যে তার কি রোগ হয়েছে এবং এই রোগের কোনো চিকিৎসা আছে কিনা। ফলে বছরের পর বছর তারা এই সমস্যায় ভুগতো এমনকি অনেক সময় কাউকে জানতেও দিতো না। এরপর আস্তে-আস্তে হাসপাতালগুলোতে ফিস্টুলা রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকলো। আর বিদেশে, দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ সার্জনও তৈরি হতে থাকলো।

আমি বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের গাইনী ও ফিস্টুলা বিভাগ এবং ন্যাশনাল ফিস্টুলা সেন্টারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। ফিস্টুলা অপারেশন জীবনে কত শত করেছি সেই হিসাব আসলে রাখিনি বরং একটা বিষয়ে সবসময় সচেতন থাকতে চেষ্টা করেছি যে কত ভালভাবে এই অপারেশনটি করা যায়। কারণ, একটি অপারেশনের সাফল্য ফিরিয়ে দেবে একটি অসহায় মেয়ের জীবন। ফিস্টুলা যে একটি মেয়ের জীবনে কতবড় বিড়ম্বনা তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।

ঢাকা মেডিকেল কলেজে অবস্থিত ন্যাশনাল ফিস্টুলা সেন্টারে ২০০৩ সাল থেকে ট্রেনিং এর উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এই সেন্টারে বর্তমানে প্রি-অপারেটিভ ওয়ার্ড, অপারেশন থিয়েটার, পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড, পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রভৃতি রয়েছে। বাংলাদেশের ১০টি মেডিকেল কলেজে প্রসবজনিত ফিস্টুলা অপারেশন হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত সবকটি হাসপাতালে সর্বমোট ১৪০০ অপারেশন হয়েছে সারা দেশে। তবে তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৭০০ টি অপারেশন হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সপ্তাহে তিনদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফিস্টুলা অপারেশন হয়ে থাকে। সারাদেশ থেকে জটিল কেসগুলো এখানে রেফার করা হয়। যদি এমন কোন রোগী আসে যার একাধিকবার অপারেশন প্রয়োজন কিন্তু একবার চলে গেলে আবার ঢাকায় আসা ঝামেলাপূর্ণ, সেক্ষেত্রে আমরা পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেই। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বেশ কয়েকজন দক্ষ সার্জন আছেন যারা সবসময় ফিস্টুলা অপারেশন করে থাকেন।

আমি একজন ফিস্টুলা সার্জন হওয়া সত্ত্বেও সবসময় অপারেশনের চাইতে প্রতিরোধের উপর বেশি জোর দেই। কারণ, অপারেশনে ব্যর্থতা থাকবেই। শতভাগ সফল অপারেশন এখনও আমরা করতে পারিনি। তাছাড়া, প্রতিরোধ না করতে পারলে এভাবে ফিস্টুলা রোগীর সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। ২০ বছরের নিচের মেয়েদের সন্তান না নেয়া, গর্ভকালীন চেকআপ, প্রসব বেদনা ওঠার ১২ ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা না হলে জরুরিভিত্তিতে হাসপাতালে নেয়া– এই কয়েকটি বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের সামান্য সচেতনতা একটি মেয়েকে ফিস্টুলার মত নিদারুণ অভিশাপ থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে।

আমি কামনা করি ফিস্টুলা নির্মূলে এ সমাজের সবাই সমবেতভাবে এগিয়ে আসবেন।"

> *"আমি একজন ফিস্টুলা সার্জন হওয়া সত্ত্বেও সবসময় অপারেশনের চাইতে প্রতিরোধের উপর বেশি জোর দেই"*

দাইয়ের ধারালো ছুরি কেড়ে নিলো চারুবালার সন্তানকে

The sharp knife of the untrained midwife took away Charubala's child

When she got married, Charubala of Bandarban, was only 15/16 years old. After 2 years, she became mother for the first time. Becoming pregnant for second time, she used to engage with heavy work and did not know about self care which led to a miscarriage. Charubala gave birth to dead children one after another within a short span of time. The husband and family did not hospitalize her. Untrained village midwives pulled the babies with sharp knives and turned Charubala to a obstetric fistula patient. But she was not taken to any treatment facility by her husband. A health worker of KARITAS brought her to the MCH and Charubala was operated for the first time in March, 2007. As she was not fully cured, the doctors again performed a second operation after 3 months with a better result. Charubala cannot forget the misbehaviour of her husband in those days. He hated the wife but the children did never hate their mother. Rather, they cared much and that is the only source of delight to poor Charubala.

"যখন আমার বিয়ে হয় তখন বয়স ছিল ১৫/১৬ বছর। বিয়ের ২ বছর পরে প্রথম মেয়ের জন্ম হয়। এরপর আবার পেটে বাচ্চা আসে। তখন আমি সবরকম ভারী কাজ করতাম। জুম চাষ করতাম, পানি তুলতাম, এবং একদিন পানি তোলার সময় ডেকচির উপরে পড়ে গিয়ে পেটে ব্যথা পাই। ফলে ৫ মাসের বাচ্চা পেটেই মারা যায়। আমি কখনোই গর্ভাবস্থায় সাবধান থাকি নাই। আলাদা করে নিজের যত্ন করার কথা জানতামই না।" বান্দরবানের আলীকদম উপজেলার চারুবালা চাকমা যখন এই কথাগুলো বলেন তখন তার বয়স ৪০ বছর।

দ্বিতীয় বাচ্চা মারা যাবার দুই মাস পর আবার তার পেটে বাচ্চা আসে এবং এই বাচ্চাটি জন্মাবার ৭ দিন পরে হঠাৎ মারা যায়। এর এক বছর পরে চতুর্থ বাচ্চার জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় চারুবালা ডাক্তার না দেখিয়ে কবিরাজের কাছ থেকে তাবিজ কবজ নিয়ে ব্যবহার করে। গ্রামের বৈদ্য ও কবিরাজের ঔষধ ও খায়। সাত মাসে এই ছেলে সন্তানটি প্রসব করে চারুবালা, তখন দুই/তিন দিন প্রচন্ড কষ্ট পেয়েছে।

কিন্তু কেউ হাসপাতালে নেয়নি। পরে তার শ্বাশুড়ি নিজেই প্রসব করান। এক বছর পর চারুবালা চাকমা পঞ্চম বারের মত গর্ভবতী হয়। তিন/চার দিন প্রচন্ড প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করে সে। কিন্তু এবারও স্বামী, শ্বাশুড়ি তাকে হাসপাতালে নিতে রাজি হয়নি। চার জন দাই প্রচন্ড চেষ্টা করে ও বাচ্চা বের করতে পারছিলো না। পরে তাদের মধ্যে একজন দাই ধারালো ছুরি দিয়ে টেনে হিঁচড়ে একটি মৃত বাচ্চা বের করলো।

চারুবালা বলেন– "এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই আমি দেখতে পাই আমার সবসময় পেশাব ঝরছে। এবং এই অবস্থা নিয়ে আমি গত ১০ বছর ধরে জীবন কাটাচ্ছি।"

চারুবালা ব্যাথা, জ্বালাপোড়া নিয়ে যন্ত্রণাকাতর দিন কাটিয়েছে, স্বামীকে বারবার বলেছে চিকিৎসা করাতে কিন্তু স্বামী কখনোই ডাক্তার দেখাতে বা তার কোন চিকিৎসা করাতে রাজী হয়নি।

এ প্রসঙ্গে চারুবালা বলেন 'স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি ছিলো না তাই সে আমার চিকিৎসা করায়নি। দুই/তিন সপ্তাহ কবিরাজী ঔষধ খাইয়েছেন।'

কারিতাসের স্বাস্থ্যকর্মীকে এই অসুখের কথা বলাতে ওখানকার শিক্ষিকা চারুবালাকে প্রথম মালুমঘাট মেমোরিয়াল খ্রীস্টান হাসপাতাল এ নিয়ে আসেন। ২০০৭ সালের মার্চ মাসে তার প্রথম অপারেশন হয়। সে সময় সে এমসিএইচ এ ১০ মাস থাকে। কিন্তু সম্পূর্ন ভালো না হওয়ায় ডাক্তার তাকে আবার ৩ মাস পরে আসতে বলে। তখন দ্বিতীয়বার তার অপারেশন হয়। দ্বিতীয় অপারেশন এর পর থেকে সে অনেকটাই সুস্থ বোধ করছে।

> *চারুবালার স্মৃতিতে সারাক্ষণ ভাসে সেই যন্ত্রণাময় দিনগুলি যখন স্বামী তার সঙ্গে না থেকে অন্য নারীর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলো আর সেই কথা জিজ্ঞাসা করলে অনবরত তার উপর নির্যাতন চালাতো*

চারুবালার স্মৃতিতে সারাক্ষণ ভাসে সেই যন্ত্রণাময় দিনগুলি যখন স্বামী তার সঙ্গে না থেকে অন্য নারীর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলো আর সেই কথা জিজ্ঞাসা করলে অনবরত তার উপর নির্যাতন চালাতো। চারুবালা সংসারের সমস্ত কাজ করতো কিন্তু তার নিম্নাঙ্গে ঘা হয়ে গিয়েছিলো। স্বামী তাকে ঘৃনা করলেও সন্তানরা কখনই তাঁকে ঘৃণা করেনি বা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। তারা তাদের সাধ্যমতো তাকে সেবাযত্ন করতো। মেয়েকে সে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়িয়েছে– এই যন্ত্রণাময় জীবনে এটুকুই যেন শান্তির পরশ।

সমস্ত প্রশংসা ল্যাম্ব হাসপাতালের সেইসব মানুষদের যাঁরা আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন– সাহিদা

All the credits go to those people in LAMB Hospital who saved my life- Shahida

স্বামীর সাথে সাহিদা

Shahida, 26, lives with her husband & in-laws in Dinajpur District. She got married at an early age and became pregnant after a few years. During pregnancy she did not go to any hospital for regular check-ups. Due to lack of proper rest and care along with the misleading suggessions of rural doctors Shahida gave birth to a dead child and developed obstetric fistula. The exception is that the husband and the in-laws were cooperative, they gave her emotional support although they could not manage to get her to any treatment facility. With the help of a field worker from the LAMB hospital and a neighbour, Shahida received the message of free fistula operation and got admitted. Her operation was successful and she got a new life.

দীর্ঘদিন আগে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে সাহিদার যে ফিস্টুলা হয়েছিলো, সম্প্রতি দিনাজপুরের ল্যাম্ব হাসপাতালে তার একটি সফল অপারেশন সম্পন্ন হয়। আমরা যখন সাহিদার মুখোমুখি হলাম তখন জানতে পারলাম তার বর্তমান বয়স ২৬ বছর। মাত্র ১৪ বছর বয়সে দিনাজপুরের গ্রাম এলাকায় তার বিয়ে হয় এবং বিয়ের অল্পকাল পরেই সে গর্ভবতী হয়। এই সময়ে নিয়মিত পরীক্ষার জন্য কোন হাসপাতালে যাওয়ার সুযোগ তার হয়নি তবে একজন গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারের পরামর্শে মাঝে মাঝে সে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বা ভিটামিন খেতো। কিন্তু তার পরিবার বা বাইরের কেউ তাকে কখনো কাছাকাছি কোন হাসপাতালে যাওয়ার ব্যাপারে সচেতন করে নাই এবং মূলত: সাহিদা এই সময়ে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেয়ারও সুযোগ পায়নি।

সাহিদা বলেন– "আমি নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার খেয়েছি সত্য কিন্তু যথেষ্ট বিশ্রাম কখনোই নেয়া হয় নাই।" যথাসময়ে তার প্রসবব্যথা শুরু হয়।

সারা রাত এবং পরদিন সারাদিন ধরে তাকে বাড়িতে রেখে প্রসব করানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রসব না হওয়ায় তাকে পরদিন সকালে নিকটস্থ পাকেরহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার ডাক্তাররাও স্বাভাবিকভাবে প্রসব করানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তখন পরিবারের অন্যান্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সাহিদাকে তার স্বামী দিনাজপুর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করলে ডাক্তাররা স্বাভাবিকভাবেই একটি জীবিত শিশু প্রসব করাতে সক্ষম হয়। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিশুটি আকস্মিকভাবে মারা যায় এবং সাহিদা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে।

সন্তান জন্ম দেয়ার নয়দিন পর হঠাৎ সাহিদা আবিষ্কার করে যে তার পরিধেয় শাড়ী, পেটিকোট সবসময় ভেজা থাকে এবং এভাবেই সে জানতে পারে যে তার শরীরে ফিস্টুলা নামে একটি রোগ বাসা বেধেঁছে। ১৬ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর সাহিদা হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আসে। নানাবিধ সমস্যার দরুণ অনেকদিন ধরে পুনরায় ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে সে বা তার পরিবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে নাই। তিন বছর পর একই সমস্যা নিয়ে সাহিদা সৈয়দপুর সদর হাসপাতালে গেলে সেখানকার ডাক্তাররা কিছু ঔষধপত্র দেয়, কিন্তু তা কোন কাজে লাগে না। অন্তত: সাত বার সাহিদা এই হাসপাতালে স্থায়ী আরোগ্যের আশায় যাতায়াত করে কিন্তু প্রতিবারই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। স্বামী এবং বাবা মা তার ভাল হওয়ার আশায় বেশ কিছু টাকা-পয়সা খরচ করে কিন্তু কোন সুফল পাওয়া যায় না। সর্বশেষে হাসপাতালের ডাক্তাররা সাহিদাকে জানায় যে ফিস্টুলা থেকে সম্পুর্ন মুক্ত হতে তার একটি ব্যয়বহুল অপারেশন প্রয়োজন। তখন তার পুরো পরিবার এই ভেবে হতাশ হয় যে,তাদের পক্ষে অপারেশনের বিপুল ব্যয় নির্বাহ করা নিতান্তই অসম্ভব।

সাহিদা বলেন– "অনবরত প্রস্রাব ঝরার কারনে আমি সবসময় মনমরা হয়ে থাকতাম। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে একমাত্র আল্লাহ আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে নতুন জীবনদান করতে পারেন। আমার স্বামী ও তার পরিবারের অন্যান্যরা সবসময় আমাকে মানসিক সহযোগিতা করতেন।"

সাহিদার স্বামী বলেন– "যখনই ডাক্তার বললেন যে এই অপারেশনে প্রচুর খরচ তখন থেকেই আল্লার প্রতি ভরসা রেখে সবকিছুকে ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছি। কখনোই তাকে একা ফেলে রাখা বা তালাক দেয়ার কথা চিন্তা করি নাই। এ বছরের শুরুতে ল্যাম্ব হাসপাতালের একজন স্বাস্থ্যকর্মী ও আর একজন প্রতিবেশী সাহিদা ও তার পরিবারের জন্য একটি সৌভাগ্যের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। তাদের মাধ্যমেই সাহিদা জানতে পারে যে, ল্যাম্ব হাসপাতাল সম্প্রতি বিনামূল্যে ফিস্টুলা অপারেশনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। দেরী না করে সাহিদাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অপারেশনের জন্য ভর্তি করা হয় তাকে। মাত্র বিশ দিন পরেই ঝলমলে হাসিমুখ নিয়ে সাহিদা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত অবস্থায় নিজের বাড়িতে ফিরে আসে এবং বারবার সৃষ্টিকর্তাকে ও ল্যাম্ব হাসপাতালের ডাক্তারদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে থাকে।"

ফিস্টুলা রোগীদের পরিবার বিচ্ছিন্নতা আমাকে তাড়িত করে – পুনম কস্তা

The very isolation of the fistula patients from their family members haunts me- Punam Kosta

Punam Kosta, working as a senior staff nurse in the department of gynae and obstetrics and currently placed at the fistula ward of the Kumudini Hospital, has been trained by EngenderHealth in fistula patient management. She provides health education, mental support and balanced diet to the fistula patients. But she thinks that these are not the important things. Field level motivation including the family members will be the biggest drive to eliminate social prejudices which are more essential to minimize the isolation from the family and ensure rehabilitation of the fistula victims.

পুনম কস্তা গত ৬ বছর ধরে আছেন কুমুদিনী হাসপাতালে। তার মধ্যে ৪ বছর তিনি লেখাপড়া করেন কুমুদিনী নার্সিং স্কুলে এবং ২ বছর ধরে কুমুদিনী হাসপাতালের স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগের ফিস্টুলা ওয়ার্ডে সিনিয়র স্টাফ নার্স হিসেবে কর্মরত আছেন। নার্সিং স্কুলে পড়ার সময় শেষ দুই বছর তিনি স্ত্রীরোগ বিভাগে কাজ করেছেন। তিনি এনজেন্ডারহেল্‌থ কর্তৃক আয়োজিত ফিস্টুলা অপারেশন পরবর্তী রোগীদের ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং নিয়েছেন। বর্তমানে পুনম কস্তা ফিস্টুলা ওয়ার্ডে রোগীদের স্বাস্থ্যশিক্ষা দেন, মানসিক শক্তি যোগান, উপযুক্ত খাবার দিয়ে অপারেশন এর জন্য তাদেরকে তৈরি করেন। তিনি বলেন– "আমি আর একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, ফিস্টুলা রোগীরা খুবই গরীব, স্বামী অথবা পরিবার, সমাজ থেকে বিতাড়িত, বিচ্ছিন্ন এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে থাকেন। ফিস্টুলা রোগীদের এই বিচ্ছিন্নতা আমাকে ভীষণভাবে তাড়িত করে। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে যার নাম নাহার।

তাকে কিছু লোকজন এই হাসপাতালে যখন দিয়ে যায় তখন সে মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ ছিলো।"

উল্লেখ্য যে, কুমুদিনী হাসপাতালে ফিস্টুলা ওয়ার্ডটি প্রসূতী ওয়ার্ডের কাছাকাছি বা সংযুক্ত। এটাকে খুবই ইতিবাচক বলে মনে করেন পুনম কস্তা।

তিনি বলেন– "এতে করে ফিস্টুলা রোগীদের সম্পর্কে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতী ওয়ার্ডের রোগীরা জানতে চান এবং তারা বাধাগ্রস্ত- প্রসবের জটিল দিক সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন। তাদেরকে যে কাউন্সিলিং দেয়া হয় তা তারা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবার পর পাড়ায়, মহল্লায় আলোচনা করেন। ফলে মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।"

পুনম কস্তা বলেন– "আর ও একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, ফিস্টুলা রোগীরা ডাক্তার বারবার বলা সত্ত্বেও একেবারেই পানি খেতে চায় না। তারা ভাবে যে বেশী পানি খেলে বেশী প্রস্রাব হবে। ফলে ফিস্টুলা রোগীদের কিডনী ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।"

পুনম কস্তা অপারেশন পরবর্তী অবস্থায় যে ফিস্টুলা রোগী পেয়েছেন তাদের ক্যাথেটার খুলে দেবার পর হাঁটাহাঁটি করার প্রবণতা বেশী দেখেছেন। গত ২ বছরে তিনি ৫৩টি ফিস্টুলা কেস পেয়েছেন। তাদের মধ্যে আরও একটি সমস্যা দেখেছেন যা হলো প্রসবপথের চারপাশে ঘা।

পুনম কস্তা মনে করেন যে এ কাজ করতে গিয়ে তিনি যে স্বাস্থ্যশিক্ষা দিয়ে থাকেন তা যথেষ্ট নয়, জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা সব চাইতে জরুরী। স্বামী, শ্বাশুড়ী ও পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা খুবই জরুরী এবং সেই সাথে সামাজিক কুসংস্কার দুর করার জন্য ও সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার। তাহলে হয়তো ফিস্টুলা রোগীদের স্বামী, পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা অনেকটাই কমে যাবে।

ল্যাম্ব হাসপাতালে আসিয়া এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ

– শ্রীমতি হেমলতা রানী

Now I am fully cured after coming to LAMB Hospital

- Hemlata Rani

Hemlata 27 years, living in Dinajpur got married at the age of 16 years and became pregnant after three years. During pregnancy she did not go for any regular check-ups. Her delivery was delayed for three days within the house by an untrained lady who used her hands to deliver a baby. From then on she could not control her motions and never did she notice it. When she conceived again, she used to go for check- ups in LAMB hospitals and gave birth to a female child but her sufferings expanded more. One village healthworker informed her that the problem is due to fistula and took her to the LAMB hospital for proper treatment. But she could not decide whether she will take the operation facility or not. Lastly, Hemlata was successfully operated upon and she returned home with great pleasure. She thinks that now her happy family with husband and two children are all the blessings of LAMB hospital.

"আমার নাম হেমলতা রানী। আমার বর্তমান বয়স ২৭ বছর। ১৬ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয় দিনাজপুর জেলার পাকের হাট উপজেলার গারো পাড়া গ্রামের দিনমজুর নির্মল কুমার এর সাথে। বিয়ের ৩ বছর পর আমার গর্ভে সন্তান আসে। বাড়ির কাছে হাসপাতাল না থাকায় কোন চেক-আপ করানো সম্ভব হয় নাই। প্রসব ব্যথা উঠলে আমাকে বাড়িতেই রাখা হয়। ৩ দিন ধরে বাচ্চা হয় না। তখন পাশের বাড়ির এক মহিলা এসে হাত চালিয়ে দিয়ে বাচ্চা খালাস করায়। আমার ছেলে হয়। ছেলের বয়স বর্তমানে ৮ বছর। কিন্তু ডেলিভারীর পর থেকেই আমার যখন তখন পায়খানা বের হয় যা আমি বুঝতেই পারতাম না।"

হেমলতার কাছ থেকে জানা যায় তার পায়খানা পড়ে গেলে সে টের পেতো না। সব সময় বায়ু নির্গত হত শব্দ করে। সবাই এতে হাসাহাসি করে তাকে ব্যঙ্গ করে কথা বলতো। সে বিষয়টি লজ্জায় কাউকে জানায়নি, এমনকি স্বামীকেও না। এমনি অবস্থায় তিন বছর চলার পর হেমলতা আবার গর্ভধারণ করে।

এ প্রসঙ্গে হেমলতা বলেন– "এরকম অবস্থায় আবার পেটে বাচ্চা আসে। এবার স্বামীকে জানানোর পরে হোমিওপ্যাথ ওষুধ খাওয়ানো হয়। কিন্তু সুস্থ হইনি। এবার নিয়মিত ল্যাম্ব হাসপাতালে চেক-আপ করাতাম। ব্যথা উঠার সাথে সাথেই দাই এর হাতে মেয়ে সন্তান জন্ম হয়। এরপর থেকে পায়খানার রোগ আরও বেড়ে যায়। কি করি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। জীবনটা অসহ্য লাগতো। স্বামী পাকের হাট থেকে ডাক্তার দেখিয়ে ঔষধ এনে খাওয়াতো কিন্তু কোন লাভ হয়নি। স্বামী ভালো হয়ে যাবে বলে শান্তনা দিতো, কিন্তু তার নিজের কাছে অপরাধী মনে হতো। এমনি অবস্থায় একদিন গ্রামের স্বাস্থ্যকর্মী আমার সমস্যা শুনে বলে ল্যাম্ব হাসপাতালের দাদার কাছে সে শুনেছে এই রোগের নাম ফিস্টুলা। স্বাস্থ্যকর্মী আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডাক্তার বলে আমার অপারেশন লাগবে। বাড়ি ফিরে এসে বাবা মা আত্মীয়-স্বজন সবার সাথে আলোচনা করি। কেউ বলে অপারেশন করো কেউ বলে করতে হবে না– এভাবে একবছর পার হয়।

এরপর এক সময় নিজের কাছে নিজের জীবনটা খুব অসহ্য লাগতে থাকে। তখন আবার গত বছর ল্যাম্ব হাসপাতালে যাই এবং সেইবারই আমার ফিস্টুলা অপারেশন হয়। ৩ সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে আমি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসি।"

হেমলতা বারবার ধন্যবাদ জানান স্বাস্থ্যকর্মীকে, ধন্যবাদ জানান ল্যাম্ব হাসপাতালকে।

হেমলতা বলেন– "আমাকে ৭ বছর এই পায়খানা ঝরার অসুখ ফিস্টুলায় ভুগতে হয়েছে। এখন আমি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি। দুই সন্তান স্বামী নিয়ে এখন আমার সুখের সংসার। এসবই ল্যাম্ব হাসপাতালের আশীর্বাদ আমার উপরে।"

নিজের উপার্জনে ছেলেকে নিয়ে ভাত-মাছ খেয়ে বেঁচে থাকতে চায় সেবিকা

Sebika wants to live on her own with her son

"The MCH has given me a disease-free new life"-says Sebika Barua Of Lama Upazilla, Cox's Bazar. Fifteen years old Sebika became pregnant after 3 months of marriage, but the delivery was conducted by the village midwife resulting a lot of complaints. Sebika was shifted to MCH with critical condition and a dead child was taken out by a machine and she developed fistula. The doctors proposed an operation for her but the husband was not willing. So, she was uncared and the husband rejected her and became separated. Sebika got cured after surgery for three times by the doctors of MCH. The bitter experience of 10 years has ended and Sebika keenly look forward to live a peaceful, happier life with her son and on her own effort.

"আমার নাম সেবিকা বড়ুয়া। আমার বয়স বর্তমানে ২৫ বছর। বাড়ি কক্সবাজারের লামা উপজেলায়। যখন আমার বিয়ে হয় তখন বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। বিয়ের ৩ মাস পর আমি গর্ভবতী হই। এ সময়ে হাসপাতালে যেতে হয় সে কথা জানতাম না। ৯ মাসে আমার ব্যথা শুরু হয়। ধাত্রী আসে বাচ্চা বের হয় না বলে কোমড় উচু করে কয়েক বার ঝাঁকুনি দেয়। বাচ্চার মাথা দেখা যায় কিন্তু বের করতে পারে না। এভাবে ২ দিন ছিলাম। এতে আমার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। লামা হাসপাতাল থেকে ৫ জন নার্স এসে ক্যাথেটার দিয়ে প্রস্রাব করানোর চেষ্টা করে কিন্তু তারা ব্যর্থ হলে আমার অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। এই অবস্থায় ৩ দিন পরে এমসিএইচ হাসপাতালে এ নিয়ে যায়। সেখানে মেশিনের মাধ্যমে চাপ দিয়ে মরা বাচ্চা বের করে। ডেলিভারীর পরে আমার পা দুটো প্রায় ১৮ দিন অবশ থাকে। চলাফেরা করতে অসুবিধা হতো বিধায় হাসপাতালেই থাকতে হয়। এরপর থেকেই এই প্রস্রাব ঝরার রোগে ভুগতে শুরু করি। হাসপাতাল থেকে যাবার সময় ডাক্তার ফিস্টুলা রোগের অপারেশন এর কথা বলেছিলেন কিন্তু আমার স্বামী করাতে চায় নাই।

বাড়ি আসার পর স্বামী আমার উপর শুরু করে শারীরিক নির্যাতন। দেবরের বউ এর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর লজ্জায় অপমানে আমার দেবর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে।

এরই মাঝে আবার আমি গর্ভবতী হয়ে পরি। তখন আমার স্বামী অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। আমার একটি ছেলে সন্তান হয়। তাতে ও স্বামীর মন আমি জয় করতে পারিনি। সে এক মাসের বাচ্চাসহ আমাকে তালাক দিয়ে দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। কারণ একজন ফিস্টুলা রোগীর সাথে সে জীবন অতিবাহিত করবে না। এর কয়েকদিন পরই আমার স্বামী দেবরের বৌকে বিয়ে করে। ২০০১ সালে এমসিএইচ হাসপাতালে আমার প্রথম অপারেশন হয়। আমি তাতে সুস্থ হইনা বিধায় আবার আমার অপারেশন হয় ২০০৪ সালে। তাতেও কাজ না হওয়ায় আবার অপারেশন হয় ২০০৫ সালে। এইবার আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হই। আমি ১০ বৎসর এই রোগের অভিশাপ বহন করেছি। আমার ছেলের বয়স এখন ৮ বছর। ৩য় শ্রেনীতে পড়ে। মানুষের বাড়িতে ঝি এর কাজ করে ছেলেকে বড় করেছি। এখন আমি ঝিয়ের কাজ বাদ দিয়ে এমসিএইচ হাসপাতালের 'মনের বাড়ি শিল্প ঘর'-এ দুই সপ্তাহের সেলাইর ট্রেনিং নিচ্ছি। ট্রেনিং শেষে কাজ করে টাকা পাবো। ছেলেকে নিয়ে ভাত, মাছ খেয়ে বেঁচে থাকবো। আমাকে অর্থ উপার্জন করে নিজের ও ছেলের ভবিষ্যতের জন্য, নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে।

OBSTETRIC FISTULA : A TRAGIC EXPERIENCE

প্রসবজনিত ফিস্টুলা : এক করুণ অভিজ্ঞতা

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

the ACQUIRE project

EngenderHealth